চর্যাপদের সংগীত-পুনর্জাগরণ-ভাবনা : 'ডমরু বাজই বীর নাদে'

মো. বাকীবিল্লাহ *

সারসংক্ষেপ : বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল শাখা – অনুবাদসাহিত্য, রাধা-কৃষ্ণকীর্ত্তন, বৈষ্ণবপদাবলি, চৈতন্যচরিত সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, পুথি সাহিত্য – কমবেশি আজও গ্রামবাংলার আনাচে-কানাচে সংগীতরূপে পরিবেশিত হয়, নাট্যরূপে-নাট্যগীতরূপে অভিনীত হয়; শুধু ব্যতিক্রম একটি ধারা – চর্যাপদ, যার জনসম্পৃক্ত কোনো পরিবেশনা নেই; অথচ তারও সাংগীতিক, নাট্যিক, সাধনতাত্ত্বিকরূপ থাকতে পারতো। কেননা চর্যাপদ-ই ছিল বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির এ পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রথম নমুনা। তবে চর্যাগীতি প্রাপ্তির পর থেকে চর্যার জীবন-দর্শনকে কেন্দ্র করে কিছু সৃজনশীল উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি রচনার প্রচেষ্টা দেখা যায়। এর গীত-সম্ভাবনা নিয়েও নানাধরনের আয়োজন পরিলক্ষিত হয়। গীত-সম্ভাবনার ধারা বর্তমানে কীভাবে, কোন পরিসরে চর্চিত হচ্ছে, সেই চর্চার পেছনে কী ধরনের সমস্যা রয়েছে তা আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। একই সাথে চর্যাগানের পুনর্জাগরণ সম্ভাবনা কতটুকু তাও এ প্রসঙ্গে বিচার্য।

প্রতিকূল সময় ও সমাজের অভিঘাতে এ দেশ থেকে বৌদ্ধসাধকরা যখন বিতাড়িত হয়েছিলেন, তখনই বাঙালির সাধন-ধন চর্যাপদ হারিয়ে যেতে পারতো চিরদিনের মতো। চর্যাপদ হারিয়ে না গেলেও চর্যার পাঠ, শ্রুতি, গীতি, নাট্যরীতিবৈশিষ্ট্য বিলুপ্তির পর্যায়েই ছিল। কিন্তু একটি ঘটনা চর্যাচর্চাকে অবশেষে বাঙালির কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। আজ থেকে শতবছরেরও বেশি সময় আগে উদ্ধার করা হয়েছিল দূরদেশ নেপালের রাজপুথিশালা থেকে জীর্ণশীর্ণ চারটি পুথি। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অন্তত চারবার নেপালে গমনের পর ১৯০৭ সালে পুথি চারটি উদ্ধার করেন, আর যখন পুথিগুলো একত্রে *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা* নামে প্রকাশ করেন তখন ১৯১৬ সাল। প্রকাশের জন্যে এতো ভাবনা আর

*সহকারী অধ্যাপক, ফোকলোর বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়।

https://doi.org/10.62328/sp.v55i1.10

এতো দেরি করবার একটি প্রধান কারণ – তিনি নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছেন চর্যাপদের ভাষা আদৌ বাংলা কি না। চর্যাপদের ভাষা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিস্তর বিতর্ক হয়েছিল, কিন্তু অন্য পুথিত্রয় অন্যান্য ভাষায় রচিত হলেও *চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়* পুথিটি যে বাংলায় রচিত হয় তা অনেক গবেষক প্রমাণ করতে সক্ষম হন। বর্তমানে চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় *চর্যাপদ* বা *চর্যাগীতিকা* নামেই বেশি পরিচিত।

হাজার বছরের নির্বাসন শেষে চর্যাগান নিজবাসভূমে ফিরে আসলেও স্বরূপে ফেরেনি, তার জায়গা হয়েছিল একাডেমিক গবেষণার হিমাগারে। তবে গবেষণার পাশাপাশি চর্যাপদ অবলম্বনে সৃজনশীল সাহিত্যের সম্ভাবনা দেখা দেয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর হাতেই। বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদের প্রথম আধুনিক পুনর্নির্মাণের পথিকৃৎ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর *বেণের মেয়ে* (১৯২০) উপন্যাসে রঙে-রেখায় উপস্থিত করেছেন চর্যার জীবন; যা বস্তুত, 'বাঙালি জাতিকে স্বর্ণোজ্বল গৌরবে' (বিশ্বনাথ ১৪১৪ : ১১) অধিষ্ঠিত করেছে। এ প্রসঙ্গে, কাহ্নপাদকে নায়কের আসনে বসিয়ে লেখা সেলিনা হোসেনের রাজনৈতিক উপন্যাস *নীল ময়ূরের যৌবন* (১৯৮২), শিবাশিস মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস *কাহ্ন* (২০০৪) স্মরণযোগ্য। যদিও এসব রচনা চর্যাপদের ঘটনা বা পদসমূহের ধারাবাহিক বা পূর্ণাঙ্গ উপস্থাপনের কোনো প্রচেষ্টা নয় বরং চর্যাকে আশ্রয় করে একধরনের পুনর্নির্মাণ – সৃজনশীল রচনা – উপন্যাস। সাইমন জাকারিয়ার *ন নৈরামণি* (১৯৯৮) নাটকে চর্যাপদের পূর্ণাঙ্গ কাহিনি পরম্পরা নির্মাণের যে চেষ্টা করা হয়, তা আরো বেশি পূর্ণতা পায় তার রচিত *বোধিদ্রুম* (২০১৪) নাটকে। এসব প্রচেষ্টা চর্যাপদের চর্চাকে মানুষের দৃষ্টিগোচর করেছিল, দিনে দিনে চর্যাচর্চার নানামুখী সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তুলছিল, যদিও এসব প্রচেষ্টার কোনোটিই চর্যাগীতির সংগীতকেন্দ্রিক ছিল না।

দুই

১৯৫০-এর দশক থেকে চর্যার সাংগীতিক পরিবেশনার সম্ভাবনা-দ্বার উন্মোচিত হতে থাকে। লন্ডন স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড স্টাডিজের সংস্কৃতের অধ্যাপক ড. আর্নল্ড এ্যাড্রিয়ান বাকে (১৮৯৯-১৯৬৩), ১৯৫৪-৫৫ সালে নেপালের এক বজ্রাচার্যের কণ্ঠ থেকে কিছু *চচা* বা *চাচা* গান রেকর্ডে ধারণ করে আনেন এবং পরে শশীভূষণ দাশগুপ্তকে শোনান। গান শুনে শশিভূষণ নিশ্চিত হন এই চচা বা চাচা গান আসলে *চর্যাগান* (যার ক্রমবিবর্তিত রূপ: চর্যা-চর্চা-চচা-চাচা)। দেশে ফিরে তিনি নেপালে গিয়ে ২০টি গান রেকর্ড করে আনেন এবং ২০০টির বেশি চর্যাগান সংগ্রহ করে ফেরেন। ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি সভায় 'নবচর্যাপদ'-এর ঘোষণা দেন তিনি। শশীভূষণ বলেন :

> এখন আমি মৎসংগৃহীত নূতন একটি পদ এবং প্রাচীনতর চর্যা সংকলনভুক্ত একটি পদের গান, – যা বর্তমান কালে বজ্রাচার্য পুরোহিত গায়কেরা গান করে থাকেন এবং যার ২০টি আমি tape record করে এনেছি – তা আপনাদের শোনাচ্ছি। তালমান সহযোগে ধীরোদাত্ত কণ্ঠে এই গান আজও বজ্রাচার্যরা গেয়ে থাকেন। (শশীভূষণ ১৯৮৯ : ২১)

১৯৭৬ সালে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগে প্রথম পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে সুখময় মুখোপাধ্যায় 'বাংলা সাহিত্য : কালে কালে' শিরোনামে যে গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন তাতে রাগ-তাল সমন্বিত সুর সহযোগে চর্যাগান হয়েছিল। (বিশ্বনাথ ২০১৬ : ১৩)

তিন

বাংলাদেশে চর্যার সাংগীতিক উপস্থাপনার বিচ্ছিন্ন প্রয়াস লক্ষ করা যায় ১৯৬০-এর দশক থেকে, কিছু ব্যক্তি-উদ্যোগে, কিছু প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে। তারা চর্যার পদসমূহে সুরারোপ ও উপস্থাপনের চেষ্টা করেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন – নরেন বিশ্বাস, আতিকুল ইসলাম, নীলুফার ইয়াসমিন, কফিল আহমেদ, শিমুল ইউসুফ, সাইম রানা, আলীম মাহমুদ প্রমুখ। আলীম মাহমুদ বৃহৎ পরিসরে চর্যাগানের ডিভিডি প্রকাশ করেন। নাট্যসংগঠন *স্বপ্নদল*-এর আয়োজনে *চর্যাগান* শিরোনামে ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে তার গীত চর্যাগানের ডিভিডি প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। (মিডিয়াখবর. কম, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪)

উপর্যুক্ত প্রত্যেক গায়ক-গবেষকই চর্যাপদের শুরুতে উল্লেখিত রাগের মধ্যে যেসকল রাগ এখনও প্রচলন আছে সেগুলোর অনুসরণ করবার কমবেশি চেষ্টা করেছেন। এবং সুরের ক্ষেত্রে তারা অধিকাংশ সময় শাস্ত্রীয় সংগীতের সুরকে অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছেন, আবার কেউ কেউ নেপালে চর্চিত চচাগানের সুরকে অনুকরণের চেষ্টা করেছেন। ২১ মে ২০১৬ সাল, বৌদ্ধপূর্ণিমাতিথিতে, *ভাবনগর* ফাউন্ডেশনের ১৬ জন সাধুশিল্পীর পরিবেশনায় হরপ্রসাদশাস্ত্রী ও প্রবোধচন্দ্র বাগচীর উদ্ধারকৃত সম্পূর্ণ চর্যাপদ, অর্থাৎ ৫০টি পদের সাংগীতিক উপস্থাপনার যৌথ আয়োজন করে *বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি* ও *ভাবনগর* ফাউন্ডেশন। (প্রথম আলো, ২১ মে ২০১৬) প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ। তিনি উদ্যোগটির প্রশংসা করেন এবং বলেন, 'চর্যার সুরারোপ ও ভাষা আরও মূলানুগ করতে পারলে ভালো ছিলা'। (শাহেদ : প্রথম আলো, ২১ মে ২০১৬) সভাপতির বক্তব্যে ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান বলেন,

> চর্যাপদের পদগুলোতে আদিতে রাগ-রাগিনীর উল্লেখ ছিল। সেসব রাগের অনেকগুলো এখনও লুপ্ত হয়ে যায়নি। সেসব রাগ অনুযায়ী গানগুলোকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। চর্যাপদের আলাদা উচ্চারণরীতি ছিল, সেই উচ্চারণরীতিও অনুসরণ করা যেতো। এছাড়া গানগুলোকে সহজ বাংলায় রূপান্তরিত করলেই সবাই যে বুঝতে পারবে তা নয়, কারণ এসব পদ রূপক। (আনিসুজ্জামান : প্রথম আলো : ২১ মে ২০১৬)

ভাবনগর চর্যাগানের সুর-সংযোজন ও উপস্থাপনে বাউল-ফকিরদের ভাবসাধনাসুর এবং তরুণ শিল্পীদের সৃজনশীলতাকে যে গুরুত্ব দিয়েছেন, তা অন্তত চারটি বিশেষত্বের দাবি রাখে। সুর-সংযোজনে তাঁরা চর্যার নির্দেশিত রাগ-রাগিনীকে আশ্রয় করলেও সেই সঙ্গে ভূখণ্ডগত কারণে লোকসুরকে আশ্রয় করেছেন, সমসাময়িক কালে শ্রোতাদের বোধগম্যতার কথা বিবেচনা করে তাঁরা প্রাচীন চর্যাপদসমূহের সমকালীন রূপান্তরিত গীতবাণীকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, বাদ্যের ব্যবহারে চর্যার নির্দেশিত বাদ্যযন্ত্রসমূহকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং চর্যাগানের নেপালে প্রচলিত সুর-বাণী এবং চর্যানৃত্য এই উপস্থাপনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

ভাবনগরের এ কার্যক্রম নিয়ে যৌক্তিক অভিমত দিয়েছেন শামসুজ্জামান খান, তিনি মনে করেন :

> চর্যাগীতি নিয়ে ভাবনগরের কর্মীবৃন্দ নতুনভাবে যে ভাবনাচিন্তা করছেন তার বিশেষ গুরুত্ব আছে। চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন উপাদান হিসেবে শুধু ইতিহাসের ধারাই রক্ষা করছে না, সেই সঙ্গে বাংলার প্রাচীন কবিদের এই কাব্যধারার মধ্যদিয়ে আমাদের মানবিকচৈতন্য, কাব্যবোধ এবং সাংস্কৃতিক জাতিসত্তাগত উপাদানকেও দীপ্র করেছে – তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। চর্যাপদের কবিতায় জীবনচৈতন্যের যে উপাদান রয়েছে তার ভিত্তিতে সংস্কৃতির নবায়ন প্রক্রিয়ায় কতটা গ্রহণযোগ্য তা বিবেচনার জন্য এই কাব্যসংগীতের নানামাত্রিক উপস্থাপনা প্রয়োজন। (শামসুজ্জামান : অদ্বয়বঙ্গাল, ২০১৬)

ভাবনগরের আয়োজনের পূর্ব পর্যন্ত চর্যাগানগুলো মূলত ক্লাসিক সুরে পরিবেশিত হয়েছে। কখনও কখনও চচাগানের সুরও অনুসরণের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু ভাবনগরের শিল্পীরা চিরায়ত বাংলার ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, বাউল-সহজিয়া, লোকগীতির সুরে চর্যাগান পরিবেশন করেন; চর্যার আদি ভাষার পাশাপাশি আধুনিক বাংলায় গানগুলো গাওয়ার চেষ্টা করছেন। *ভাবনগর* ফাউন্ডেশনে চার বছর ধরে *ভাবনগর* সাধুসঙ্গের শিল্পীরা চর্যার রাগ-সুর-পরিবেশনা নিয়ে নিরন্তর গবেষণা করে চলেছেন। ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের *সাধুসঙ্গ* চত্বরে প্রতি বুধবার দেশি-বিদেশি গবেষক-শিল্পী আর সাধারণ মানুষের সামনে নিরীক্ষামূলকভাবে তারা পরিবেশন করেন চর্যাগান। ২৬ নভেম্বর ২০১৫ বৃহস্পতিবার *ভাবনগরের* সাধুশিল্পীরা পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারে চর্যাগানের আয়োজন করেন। সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭.৩০টা পর্যন্ত চলে

চর্যাগানের পরিবেশনা। এতে *ভাবনগর* শিল্পীদের পাশাপাশি স্থানীয় সাধকশিল্পী হাবিবুর রহমান, নান্নু সরকার, বাবুল আক্তার বাচ্চু গান পরিবেশন করেন। স্থানীয় দর্শক-শ্রোতা ছাড়াও এই পরিবেশনা পর্যবেক্ষণের জন্যে উপস্থিত ছিলেন, জাপানের হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লালন-গবেষক মাসাহিকো তোগওয়া ও তাঁর একদল শিক্ষার্থী এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক মাসউদ ইমরান মান্নু। (কালের কণ্ঠ : ৩০ নভেম্বর ২০১৫) বর্তমানে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, নওগাঁ, কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের সাধক শিল্পীগণ নিয়মিত চর্যাগান পরিবেশন করে চলেছেন। তাদের লক্ষ্য, চর্যাগানের পুনর্জাগরণ ঘটানো এবং চর্যা-সংস্কৃতিকে জীবন্ত সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত করা।

চার

বাংলাদেশে বিভিন্ন পর্যায়ে চর্যাগানের যে চর্চা শুরু হয়েছে তার মধ্য দিয়ে কিছু প্রশ্ন সামনে চলে এসেছে। যেমন : চর্যাগানের প্রকৃত সুর-তাল কী বা কী হওয়া উচিৎ? যেসকল রাগ আর চালু নেই সেক্ষেত্রে কোন রাগ অনুসরণ করা হবে? কী ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হবে? এবং আজকের দিনে চর্যাপদ কোন ভাষায় গীত হবে? এসব প্রশ্নের ঠিকঠাক উত্তর পাওয়া আজ আর সম্ভব নয়। যা সম্ভব, তা হলো, যেটুকু সূত্র-নমুনা আছে তা ধরে সামনে এগিয়ে যাওয়া এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মানসকেও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় রাখা।

আজ থেকে হাজার বছর বা তারও আগে রচিত সাধনসংগীত চর্যাগীতির সুর কেমন ছিল তা নিশ্চিতভাবে জানা আর সম্ভব নয়। তাই চর্যাগানে কেমন সুর ছিল বা কোন সুরে চর্যাগান গাওয়া যেতে পারে তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে রয়েছে নানা বিতর্ক। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু মত :

১. ১৯০৭ সালে আবার নেপালে গিয়া আমি কয়েকখানি পুথি দেখিতে পাইলাম। একখানির নাম 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়', উহাতে কতকগুলি কীর্তনের গান আছে ও তাহার সংস্কৃত টীকা আছে। গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্তনের মতো, নাম 'চর্য্যাপদ'। (হরপ্রসাদ ১৩৫৮ : ভূমিকা)

২. [চর্যার এই গানগুলি] লোকগীতি পদ্ধতিতে লেখা। (সেন ১৯৯৫ : ২১)

৩. চর্যাগীতি উৎসবে ও অবসর বিনোদনে গাওয়া হইত, যেমন আধুনিক কর্তাভজারা করে। (সেন ১৯৯৫ : ৩১)

৪. ১০০০ বছর আগে চর্যা কিভাবে গাওয়া হতো সেটা অবশ্যই আমাদের সবার নাগালের বাইরে। অন্যদিকে বাউল-ফকির-সহজিয়া সম্প্রদায়গুলির সাথে চর্যাপদের ভাব-বিশ্বের মিল অনস্বীকার্য। (হানস ২০১৬, ১৯)

৫. [চর্যার] রাগের যে রূপ এখন আমরা পাই, সেই রকমটাই কি ছিল তখন? না কি ছিল কোন ভিন্ন চেহারা? গানের সঙ্গে একরকম বাজনা বাজানো হতো বলা হয়, সেটাই-বা

কী রকম বাজনা? তা ছাড়া, রাগরাগিনীর নামটাই তো যথেষ্ট নয়, গাওয়ার ঢংটার উপরেও অনেক কিছু নির্ভর করে। আমার তো মনে হয় এর একটা বহতা ধারা ছিল যা বাউল গান পর্যন্ত এসে মিশেছে। (শান্তিদেব (শঙ্খঘোষ উদ্ধৃত) ২০১৩ : ৬৮)

৬. আজও বিভিন্ন পূজায় বা অনুষ্ঠানে চর্যাগীতি 'চাচা' বা 'চচা' গান নামে নেপালে ও সন্নিহিত অঞ্চলে গেয়ে থাকেন বৌদ্ধ বজ্রযানী সিদ্ধাচার্যেরা। এ গান নিশ্চয় সহস্রাব্দ-পূর্বের তাল-মান-রীতি পদ্ধতি মেনে গীত হয় না; তবে তার অপভ্রংশরূপ নিশ্চয়ই। (বিশ্বনাথ ২০১৬ : ১৩)

বাংলা সংগীতের ইতিহাস অন্বেষণে ফিরে যেতে হয় খ্রিষ্ট জন্মের প্রায় দেড়হাজার বছর বা তারও আগে, বৈদিকযুগে। সমগ্র আর্যজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ *বেদ*। *বেদ* চারভাগে বিভক্ত– *ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব*। সংগীতের মূল উৎস হিসেবে *সামবেদকে*ই চিহ্নিত করা হয়। তবে এর আগেও ভারতে সভ্যতা ছিল এবং অনার্য, দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতির ভাষা-সংগীত ছিল। (প্রভাতকুমার ২০১১ : ১৫) কিন্তু সেসবের বিশেষ লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। বৈদিকযুগের সামগানের বা তার আগের গানের রূপ হলো, স্বর-সংযোগে স্তোত্র ও মন্ত্রের আবৃত্তি; যা ছিল একান্তই প্রার্থনার মাধ্যম। এই একই সময়ে, বৈদিক যুগে, লৌকিক স্বর সহযোগে লোকসংগীতের প্রচলন ছিল বলে মনে করা হয়। (প্রবীর (সম্পা. অরুণ) ২০০৬ : ২) ভারতবর্ষীয় সংগীতের সঙ্গে পাশ্চাত্য ধারার সংগীতের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে – পাশ্চাত্য যেখানে সংগীতকে মূলত শ্রান্তি বিনোদনের মাধ্যম মনে করে, শারীরিক কসরৎকেই প্রাধান্য দেয় সেখানে ভারতীয়রা সংগীতকে ঈশ্বরের নৈকট্যসাধনার উপায়, নিজেকে শান্ত-সমাহিত রাখার মাধ্যম মনে করে। স্রষ্টার থেকে সৃষ্টির যে আদি বিচ্ছেদ, সে বিচ্ছেদ এখনও ফুরোয়নি। সৃষ্টি সেই বিচ্ছেদ-বিরহকে সুরে রূপান্তরিত করেছে, গানে রূপ দিয়েছে অর্থাৎ সংগীত আমাদের সাধনার মাধ্যম, প্রার্থনার পথ। এই বৈদিক সংগীতই ভারবর্ষীয় সংগীতের প্রথম ধারা। এই কালে লোকায়ত জীবনে কী ধরনের সুর প্রচলন ছিল তা জানা যায় না।

গান্ধর্বগানের বিবরণ ৫০০-১০০ খ্রিস্টপূর্বে রচিত ভরতের *নাট্যশাস্ত্রে* পাওয়া যায়। এই গান্ধর্বসংগীতকে বলা হচ্ছে ভারতবর্ষীয় সংগীতের দ্বিতীয় ধারা। তৃতীয় ধাপের পরিচয় পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব ১০০ থেকে ৩০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত গুরুত্বপূর্ণ সংগীতশাস্ত্রীয় গ্রন্থ মতঙ্গের *বৃহদ্দেশীতে*। মতঙ্গ এই গ্রন্থে আঞ্চলিক সংগীত বা *দেশী* সংগীতের বিবরণ দিয়েছেন। একই সঙ্গে প্রথমবারের মতো রাগের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। ভারতীয় সংগীতে রাগের স্বরূপ আবিষ্কার করেছেন মতঙ্গ। [প্রবীর (সম্পা. অরুণ) ২০০৬ : ৪] ভারতে বর্তমানে সঙ্কর ও পরিবর্তিতরূপ বাদে ন্যূনধিক ৪০০ রাগ রাগিনী স্তরীভূত অবস্থায় রয়েছে। এদের মধ্যে কিছু কিছু অতিপ্রাচীন, কিছু বা অর্বাচীন এবং চতুর্থ শতকে জন্মেছে। [ব্রজেন্দ্রনাথ ২০০৮ : ২০] অনুমান করা হয়, এই দেশীয় সংগীত ধারা থেকে বিকশিত হয়েছে চর্যাগান। তবে বৈদিক যুগের গান,

গান্ধর্বগান বা তার পরবর্তী সময়ের দেশি গানের কোনো পরিবেশনা আজ প্রচলিত নেই। তাই সেসব গান কোন সুরে গাওয়া হতো তার সুর জানার নিশ্চিত কোনো উপায় নেই। তাই আমাদের নির্ভর করতে হয় রাগ-তালের উপর।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত চর্যাপদে গান ছিল সাড়ে ৪৬টি। প্রবোধচন্দ্র বাগচী তিব্বতি-মহাগ্রন্থ তান্‌জুর থেকে চর্যার তিব্বতি/ভূটিয়া অনুবাদ খুঁজে বের করে হারানো সাড়ে ৩ টি পদের অনূদিত পাঠ প্রকাশ করেন। একটি পদ ছাড়া বাকি ৪৯ টি পদের সামনে রাগের নাম উল্লেখ আছে। মোট রাগ সংখ্যা ১৮টি – পটমঞ্জরী, গবড়া, গউড়া, অরু, গুঞ্জরী,কাহ্ন-গুর্জরী, দেবক্রী, দেশাখ, ভৈরবী, কামোদ, ধনসী, রামক্রী, বরাড়ী, শাবরী, মল্লারী, মালসী, বঙ্গাল, মালসী-গবুড়া। এর মধ্যে বর্তমানে *দেবক্রী, গউড়া বা গবড়া, মালসী গবুড়া, শবরী, বঙ্গাল, কাহ্নগুর্জরী প্রভৃতি অনেক রাগই আজ বিলুপ্ত।* (মৃদুলকান্তি ২০০৫ : ১৭) প্রবোধচন্দ্র বাগচী উদ্ধারকৃত-অনূদিত ২৪ সংখ্যক চর্যায় ইন্দ্রতাল নামে একটি তালের উল্লেখ আছে, সেখানে রাগের উল্লেখ নাই।

চর্যাপদের শুরুতে যেহেতু রাগের নাম উল্লেখ আছে আবার একটি পদে তালের নাম আছে, তাই গবেষকগণ ধারণা করেন, অন্যগুলোর মধ্যেও হয়তো তালের নাম ছিল। এই প্রাপ্ত রাগ-তালের ওপর ভিত্তি করে পণ্ডিতগণ আলোচনা করেছেন। একদল রাগ-তাল দেখে চর্যাকে শাস্ত্রীয় সংগীত বলে নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ করতে চান। অন্যদল, চর্যাপদের বিষয়ানুষঙ্গ এবং প্রাচীনকালের শাস্ত্রীয় সূচনা পর্বের কথা বিবেচনা করে চর্যাকে বাউল সহজিয়া সুরে গাওয়াকেই যুক্তিসঙ্গত মনে করেন।

চর্যার শুরুতে রাগ-তালের উল্লেখ থাকায় চর্যাকে শাস্ত্রীয় সংগীতরূপে দাবি করা হয়। তবে মনে রাখতে হবে, চর্যাপদের যে রাগের ব্যবহার বা তার আগের সংগীতধারায় কমবেশি যে রাগের নামোল্লেখ – তা আজকের দিনের মতো এমন সুশৃঙ্খল, নিয়মাবদ্ধ, দৃঢ় শাস্ত্রবদ্ধ নিশ্চয় ছিল না, কালপর্ব বিবেচনায় থাকার কথাও নয়। বরং তা ছিল রাগ-তালের প্রাথমিক রূপ, মন্ত্রোচ্চারণের সুরকে, লৌকিক সুরকে, দেশীয় সুরকে শাস্ত্রবদ্ধ করার প্রাথমিক প্রচেষ্টা। দেশীয় সঙ্গীতের এই প্রাথমিক ধারা যেমন দিনে দিনে শাস্ত্রবদ্ধ হওয়া শুরু করে, তেমনি বাউল সহজিয়া সুরও বিস্তার লাভ করে। অর্থাৎ চর্যাপদের এই সময় বা পরবর্তীসময় থেকে সংগীতে স্পষ্টত দুটি ধারা তৈরি হতে থাকে। তাই চর্যাকে শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রাথমিক উত্তরাধিকার দাবি করা যেমন সঙ্গত, তেমনি বাউল সহজিয়া সংগীতের প্রাথমিক স্তর বলাও যুক্তিযুক্ত।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সুকুমার সেন, শান্তিদেব, হান্‌স হারডার প্রমুখ পণ্ডিত চর্যার সুরে কীর্তন, লোকগীতি, কর্তাভজা, বাউল-ফকির-সহজিয়া, ঝুমুরগানের সুর-তাল-ঢঙের সাযুজ্য লক্ষ্য করেছেন। ১৯০৭ সালে চর্যার আবিষ্কর্তা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে চর্যাগানে কী ধরনের সুর শুনেছিলেন? তার কেন মনে হলো, গানগুলো বৈষ্ণবদের

কীর্তনের মতো। এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেলে চর্যার সুর উদ্ধার সহজ হতো। সুকুমার সেন লোকগীতি বা কর্তাভজার কাছাকাছি সুর যে দাবি করেছেন, তা মূলত চর্যার বিষয়াঙ্গিক, সুর সম্ভাবনা বা গাওয়ার ঢঙের প্রতি লক্ষ্য রেখেই। শান্তিদেব নেপাল থেকে উদ্ধারকৃত চর্যাগানের রেকর্ড শুনে সেগুলোকে বাউল গানের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

বিশ্বনাথের দাবি অনুযায়ী, নেপালের চর্যাগানে যদিও প্রাচীন চর্যাপদের কিয়ৎ রূপের বা অপভ্রংশর রূপের অনুসরণ করা হতো, তার পরেও কিন্তু বহুকাল পেরিয়ে গেছে। মনে রাখতে হবে, নেপাল একটি স্বতন্ত্র রুচি-সংস্কৃতির দেশ। আর তাই তাদের দেশের রুচি-সংস্কৃতি-শিল্প তাদের জীবনধারা অনুযায়ী বিবর্তিত হবে সেটাই স্বাভাবিক। মনে করার কারণ নেই, হাজার বছর আগের চর্যাগানের সুর তারা অনুসরণ করে চলেছেন। এখন সেই বিবর্তিত রূপ তথা বর্তমান নেপালে চর্চিত চচা বা চাচা গানের 'ক্লান্তিকর একঘেঁয়ে' সুরকে অনুসরণ করা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত হবে? আবার শুধু রাগ অনুসরণ করলেও সমস্যার সমাধান হয় না। কেননা, দেবক্রী, গউড়া বা গবড়া, মালসী গবুড়া, শবরী, বঙ্গাল, কাহ্ন-গুর্জরী প্রভৃতি রাগ আজ আর প্রচলন নেই। সেক্ষেত্রে এইসব রাগোল্লেখিত গানের রাগের কী হবে তার কোনো সমাধান নেই। তাই শুধু রাগের নামে চর্যার পূর্ণাঙ্গ সুর নির্ধারণ অসম্ভব। সুতরাং, অধিকাংশ গবেষকের মতানুসারে এবং যুক্তি বিবেচনায় চর্যাগান লোকসুরে গাওয়াতে সমস্যা নেই।

চর্যাগানে অনাহত ডমরু, ঘণ্টা, নূপুর এমন কয়েকটিমাত্র বাদ্যযন্ত্রের নামোল্লেখ আছে। এই নামের মধ্য দিয়ে চর্যাগানের সুর-বাদ্যের স্বরূপ আবিষ্কার কঠিন। তাই আজকের দিনের চর্যাগানে কোন ধরনের বাদ্য ব্যবহৃত হবে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। তবে একথা ঠিক, চর্যাগান আজকের দিনে গীত হলেও, তাতে উল্লিখিত বাদ্যযন্ত্রের পাশাপাশি দেশীয় বাদ্যের ব্যবহার করাই সঙ্গত।

চর্যায় অনুসৃত ভাষা প্রসঙ্গে বললে, সবার আগে আদিবাংলা ভাষা প্রাধান্য পাবে, এবং তাই সঙ্গত। কিন্তু হাজার বছর আগের বাংলা ভাষা বোঝার ক্ষমতা খুব কম মানুষের আছে। তাই চর্যা সংগীতে আদি ভাষা ব্যবহার করলে তবে এ প্রবন্ধের যে আলোচ্য বিষয়, সাংগীতিক সম্ভাবনা, সম্পূর্ণরূপে না হলেও তা অনেকাংশে মার খেয়ে যায়। কেননা চর্যাচর্চাকে গণমানুষের কাতারে পৌঁছে দিতে গেলে অবশ্যই ভাষাকে তার কাছাকাছি আনতে হবে, যা প্রাচীন ভাষায় সম্ভব নয়। এছাড়া, চর্যার ভাষা রূপক-প্রতীক আশ্রিত, যার অর্থোদ্ধার শুধু 'লুই ভণই গুরু পুছিও জান'তেই সম্ভব। এ অবস্থায়, আদি ভাষার রূপান্তরিত বা অনূদিত ভাষা কী হবে তা নির্ধারণ করাও কঠিন। আবার, রূপান্তরিত ভাষায়, আদি ভাষার সেই ভাব-ঔদার্য কতটুকু থাকবে তা নিয়ে বিতর্ক থেকে যায়। আধুনিক রূপান্তরে, সুর সংযোজনে নিশ্চয় আদিভাবেরও

কিছুটা ব্যাঘাত ঘটবে। এ প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র উদাহরণ দেয়া যায়। 'মহুয়া', 'মলুয়া', 'দেওয়ান মদিনা', 'কাজল রেখা' প্রভৃতি প্রায় সকল পালা আজও বৃহত্তর ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে দর্শকের সামনে, আসর জমিয়ে গীতিরূপে, গীতিপালানাট্যরূপে পরিবেশিত হয়। অক্ষর-জ্ঞানহীন এইসব পালাকার, অভিনেতারা, যারা প্রকৃত অর্থে এইসব ঐতিহ্যের লালক-পালক, তাদের অনেকে আদৌ জানেন না, এগুলোকে গীতিকা বলে বা মহুয়া মলুয়া পালা বলে। তারা বরং এগুলোকে কেচ্ছাগান নামেই ডাকেন। দেবী মনসাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আঙ্গিকে মনসার ভাসান, ভাসান যাত্রা, বেহুলার নাচাড়ি/লাচাড়ি, বেহুলার ভাসান, পদ্মাবতীর আখ্যান ইত্যাদি শিরোনামে নাট্যগীতের পরিবেশনা রয়েছে, যে সকল পরিবেশনার সঙ্গে লিখিত সাহিত্য বিজয় গুপ্ত রচিত *মনসামঙ্গল* কাব্যের সম্পর্ক রয়েছে সামান্যই। কিন্তু এসব ধারা জীবন্ত। চলমান, বহমান সংস্কৃতি-শিল্পধারার ধর্মই হলো, দেশ-কাল-দর্শকের রুচি-পছন্দসই পরিবর্তনশীলতা। চর্যাগান যদি হারিয়ে না যেতো, তবে তা ঐ হাজার বছর আগের রূপ নিয়ে নিশ্চয় থাকতো না।

সুতরাং, চর্যাকে সাংগীতিকরূপে, পরিবেশনারূপে গণমানুষের কাছে পরিবেশন করতে চাইলে চর্যাগান আদি ভাষায় গাওয়ার পাশাপাশি আধুনিক বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করে গাওয়া যেতে পারে।

পাঁচ

চর্যাপদ প্রকাশের পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত চর্যাগান চর্চার অবস্থা অলোচনার পাশাপাশি কয়েকটি বিষয় সামনে রেখে এ আলোচনা শুরু হয়েছিল। তারমধ্যে একটি বিষয় ছিল চর্যগানের সুর প্রসঙ্গ। চর্যাগান কোন সুরে গাওয়া হবে তা নিয়ে একতরফা কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া প্রায় অসম্ভব। শাস্ত্রীয় ও বাউল-সহজিয়া দুদিকেই তার সম্ভাবনা। ভাষার ক্ষেত্রেও আদি বাংলা ভাষার পাশাপাশি আধুনিক বাংলায় চর্যাগান করা যেতে পারে। চর্যায় বর্ণিত বাদ্যযন্ত্রের পাশাপাশি দেশীয় বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। সবকিছুর পরে, চর্যাগান যদি জনগণের মাঝে পুনর্জাগরণ লাভ করে, মানুষ যদি চর্যাগান গ্রহণ করে এবং গবেষকগণও যদি উৎসাহিত হন তবে ভবিষ্যতে চর্যার সুর, বাদ্যযন্ত্র, ভাষা প্রসঙ্গে আরও সুস্থিত সিদ্ধান্ত আসবে।

গ্রন্থপঞ্জি

শশীভূষণ দাশগুপ্ত সংগৃহীত/অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও সংকলিত (১৯৮৯)। *নবচর্যাপদ*, কলিকাতা

নাজনীন মর্তুজা ও নূরুননবী শান্ত সম্পাদিত (২০১৬), *অদ্বয়বঙ্গাল*, ঢাকা

প্রবীর সেনগুপ্ত, অরুণ সরকার সম্পাদিত (২০০৬)। *বাংলার গান বাংলা গান*, কলকাতা

প্রভাতকুমার গোস্বামী (২০১১)। *ভারতীয় সঙ্গীতের কথা*, কলকাতা, পরিবর্ধিত ষষ্ঠ সংস্করণ

ব্রজেন্দ্রনাথ দত্ত (২০০৮)। *রাগ সঙ্গীত ও প্রাচীন ভারত*, প্রথম প্রকাশ, দীপায়ন, কলকাতা

মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী (২০০৫)। *বাংলা গানের ধারা*, প্যাপিরাস, ঢাকা

শঙ্খ ঘোষ (২০১৩)। *ছেঁড়া ক্যাম্বিসের ব্যাগ*, কলিকাতা, ২০১৩ সংস্করণ

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত (১৩৫৮)। হাজার বছরের বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ

পত্রিকা

কালের কণ্ঠ, ৩০ নভেম্বর ২০১৫, ঢাকা

প্রথম আলো, ২১ মে ২০১৬, ঢাকা

মিডিয়াখবর.কম, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪, ঢাকা

সুবিমল মিশ্র সম্পাদিত (১৪১৪), *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, ১১৪ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা